নারী রুদ্ধ জানালায়

• আনোয়ারা আজাদ

তোমার সমস্যাটা কোথায় জানতে পারি?

আমার এক বান্ধবীকে স্কুলজীবন থেকেই বিষণ্ন অবস্থায় দেখেছি। এই পরিণত বয়সে এসেও তাকে আমি একই রকম দেখছি। কোনো উচ্ছ্বাস নেই, শুধুই বিষণ্নতায় ডুবে থাকা। সেই বয়সে এসব বিষয় নিয়ে যে কথা বলতে হবে, তা-ই তো জানতাম না। এখন জানি বলেই একদিন জিজ্ঞেস করলাম।

বলে নিই আমার বান্ধবী একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। বিষণ্ন থাকলেও তার হালকা রসিকতা মাঝে মাঝে মন প্রফুল্ল করে দেয়। সেই ভরসাতেই জিজ্ঞেস করা। তা না হলে মুখের যা অভিব্যক্তি!

ছেলেটা ঠিকমতো কথা শোনে না, সারাক্ষণ নেটে বসে টুকুস টুকুস করে। বাপটাও আছে নিজের মতো, বাসায় থাকলে সারাক্ষণ বসে টিভি দেখে আর তসবিহ গোনে।

এই যদি অবস্থা হয়, বান্ধবীর মন প্রফুল্ল থাকে কি করে বলুন! তাই তো বিষণ্ন মেঘেদের লেপ্টে থাকা! ওর আর দোষ কি!

ঠিক আছে, এখন না হয় বাপ-ছেলেতে বশ মানছে না বলে মুখ লটকায় থাকো, কিন্তু ছোট থেকেই তো এমন ফর্সা মুখটায় ধূসর গোধূলির ক্রিকেট খেলা দেখছি।

নড়ে চড়ে বসে বান্ধবী। একটুখানি ঠোঁট ফোলায়!

ছোটবেলায় বাড়িতে অনেক কাজ করতে হতো, ভাইয়া আমার চেয়ে দুবছরের বড় অথচ মা তাকে একটা কাজও করতে বলতেন না, আমাকেই বলতেন। বালতি বালতি পানি টেনে ঘর মুছতেও হতো। সব সময় তো কাজের লোক থাকত না। তাছাড়া মা একটু শুচিবাইগ্রস্তও ছিলেন। অত বড় বাড়ি ধোয়ামোছা কি সহজ কথা বলো? আমার কষ্ট হতো এই ভেবে যে, ভাইয়াকে সব সুযোগ সুবিধা দেয়া হতো কিন্তু আমরা বোনেরা সেই সুবিধাগুলো পেতাম না।

বান্ধবী মোটামুটি অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। বৈষম্যের শিকার হয়ে তারই যদি মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা এভাবে ব্যাধির দিকে ধাবিত হয় তাহলে খুব সাধারণ মেয়েদের পরিবারে বৈষম্যের শুরু কীভাবে কিংবা কেমনভাবে সেটা বোঝা কি খুব কঠিন!

তবে শুরু এটা নয়, শুরু আরো আগে থেকে

অপরাধীদের পেট থেকে কথা বের করার মতো আমাদের এক বন্ধুকে জেরা করেছিলাম তার ব্রেকআপের কারণ জানার জন্য। অনেকে এমনিতেই হড়হড় করে সব বলে দেয় অপরপক্ষকে দোষারোপ করে। আর এ কেন এমন সাধু সেজে বসে থাকছে কোনো দোষারোপ ছাড়াই! আমাদের তো জানতে হবে বন্ধু! না বললে হবে! হবে না। তাই যতবারই দেখা হয়েছে, কৌশলে প্রসঙ্গটি তোলার চেষ্টা করেছি। কেন জানি মনে হয়েছে স্বাভাবিক আর দশজনের মতো

শিশুটি বোঝেই না তার সঙ্গে কী হচ্ছে। কিন্তু যখন সে বুঝতে শেখে তখন এই স্মৃতিগুলো ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে তাকে কুরে কুরে খায়, বিচলিত করে। সে লজ্জায় ঘৃণায় নিজের কাছেই গুটিয়ে থাকে। তার ভাবনা চিন্তা প্রসারিত করার মানসিকতা হারিয়ে ফেলে। ফলে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত হলেও সেই কুণ্ঠিত হয়ে যাওয়ার বলয় থেকে বের হতে পারে না, আত্মবিশ্বাস তৈরি হতে পারে না

নয় এর বিষয়টি। বোঝা যাচ্ছে দুজন দুজনকে শ্রদ্ধা করে, ভালোও বাসে তারপরেও কেন!

কমপ্রোমাইজ করে নেয়া যায় না?

না, যায় না।

ফিফটি পারসেন্ট মেনে নিয়ে সংসারটা টিকিয়ে রাখা যেত না? হানড্রেড কি হয় কোনো সংসারে?

এটা হানড্রেড ফিফটির বিষয় নয়।

তাহলে বিষয়টা কী, এটা না জেনে তো ঘুমাতে পারছি না! মানুষের সাইকোলজি জানার যে প্রবল আগ্রহ আমার।

শেষ পর্যন্ত বের করতে পেরেছি। শিশুকালে বন্ধুর স্ত্রী তার নিজের বাবার হাতে অ্যাবিউজ হয়েছিল। ভাবুন! মানসিক বিপর্যয় তখন থেকেই। বড় হয়ে এজন্য বিয়ে না করারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সে কিন্তু আমার বন্ধুটির সঙ্গে প্রেম হয়ে যাওয়ার পর বিয়ে করেছিল। কিন্তু করলে কী হবে, কিছুতেই ওই বিষয়টাতে সে অ্যাডজাস্ট করতে পারছিল না। আর সবকিছু ঠিকঠাক চলছে কিন্তু ওই সময়টাতেই মেয়েটি সাংঘাতিকভাবে রিঅ্যাক্ট করছে। কতদিন চলতে পারে এমন! শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত ব্রেকআপের। মেয়েটি নাকি একদম নিজের মতো করে থাকতে চায়। যে স্বামী তাকে ভালবাসে জেনেও যদি কোনো নারীর মনের অবস্থা এরকম হয়, মানসিকভাবে সে কতটা অসুস্থ আন্দাজ করুন! এক্ষেত্রে কোনো ওষুধই কাজ করবে না আমি বলে দিতে পারি। পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ জায়গাটাতেই যদি ফাটল দেখা যায়, তাহলে সে কোথাও দাঁড়ানোর সাহস পায় কি করে বলুন!

আমার পরিচিত এক মেয়ে একটি এনজিওতে চাকরি করার সুবাদে শিশু অবস্থাতেই মেয়েদের মানসিক স্বাস্থ্যহানির বেশকিছু তথ্য দিয়েছিল। এই তথ্যগুলো অত্যন্ত করুণ, হৃদয়বিদারক আর ভয়ঙ্কর। নিজের পরিবারের মানুষদের দ্বারাই এই ঘটনাগুলো ঘটে থাকে। চাচা, মামা, দূরসম্পর্কের ভাই এমনকি নানা-দাদাদের সম্পর্কেও রিপোর্ট পাওয়া যায় বলে জানা যায়। এদিকে শিশুটি বোঝেই না তার সঙ্গে কী হচ্ছে। কিন্তু যখন সে বুঝতে শেখে তখন এই স্মৃতিগুলো ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে তাকে কুরে কুরে খায়, বিচলিত করে। সে লজ্জায় ঘৃণায় নিজের কাছেই গুটিয়ে থাকে। তার ভাবনা চিন্তা প্রসারিত করার মানসিকতা হারিয়ে ফেলে। ফলে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত হলেও সেই কুণ্ঠিত হয়ে যাওয়ার বলয় থেকে বের হতে পারে না, আত্মবিশ্বাস তৈরি হতে পারে না। এই স্মৃতিগুলোই অনেক সময় নারীদের দাম্পত্য জীবনে বিঘ্ন ঘটায়। দাম্পত্য সুখের বিষয়টিই তার কাছে একধরনের ভৌতিক প্রহসন বলে মনে হয়। সবচেয়ে বড় কথা, সে কোনো পুরুষকেই বিশ্বাস করতে পারে না। তার জীবনসাথীকেও সে সন্দেহের চোখে দেখে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, শিশুকাল কিংবা কৈশোরকাল থেকেই একজন নারীর মানসিক স্বাস্থ্য কেমন ভঙ্গুর অবস্থায় দেহের

ভেতর লুকিয়ে থাকে। এ অবস্থায় থেকেই তাকে হাসতে হয়, কাঁদতে হয়, সংসারের দায়িত্ব পালন করে যেতে হয়। আমি ঠিক জানি না কত শতাংশ মেয়েকে এরকম ভৌতিক স্মৃতি জড়িয়ে বড় হতে হয়। কারণ কোনো মেয়ে আজ পর্যন্ত সরাসরি মুখ খোলেনি, একান্তে নিভৃতে দু'একজন ছাড়া। ইদানীং নানা রকম এনজিওর কল্যাণে কিংবা দু'একজন সাহসী প্রতিবাদী মেয়ের এ বিষয়ে সোচ্চার হওয়ার সুবাদে জানতে পারছি।

তবে সত্যি কথা বলতে কি, অধিকাংশ মেয়ের শৈশবকাল থেকেই বোধহয় জীবন শুরু হয়ে যায় মানসিক বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে। শুধু প্রকারভেদটা ভিন্ন।

দশ-এগারো বছর বয়সে যখন মেয়েদের পিরিয়ড শুরু হয়ে যায়, তখন তো মন এবং শরীর নিয়ে রীতিমতো যুদ্ধ শুরু! ব্যাপারটা বুঝতে এবং সামলে উঠতে অনেক সময় লেগে যায়। এ সময় তার ভেতর একটা অস্থিরতাও তৈরি হয়। নিজেকে লুকিয়ে রাখার, আড়াল করে রাখার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। শহরের মেয়েরা তাও অনেক সুবিধা পায় কিন্তু গ্রামের মেয়েদের অবস্থা খুব করুণ। সম্ভবত একটা হীনম্মন্যতাও গড়ে ওঠে সে সময়, যেটা পরবর্তীকালেও থেকে যায়। ফলে বড় কোনো স্বপ্ন দেখতেও সে সাহস পায় না। তার জীবন আবর্তিত হয় একটা সীমাবদ্ধতার ভেতর। তবে হ্যাঁ, আমি আশা রাখি একটা সময় এ অবস্থাটা কেটে যাবে। যখন মায়েদের উচ্চশিক্ষার হার বেড়ে যাবে, মায়েরা এই সময়টাতে মেয়েদের শারীরিক এবং মানসিকস্বাস্থ্যের দিকে পূর্ণ নজর দেবেন এবং সাহায্য করবেন। বিষয়টি এড়িয়ে যাবেন না কিংবা অবহেলা করবেন না।

মেয়েদের অল্পবয়সে জোর করে বিয়ে দেয়াটাও মানসিক স্বাস্থ্যহানির আরেকটি ক্ষেত্র। আজ পর্যন্ত আমার দেখা অল্পবয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়া কোনো মেয়েকে আমি মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখিনি। তারা সংসার চালিয়ে নিয়ে যায় ঠিকই কিন্তু অসুস্থতার একটা পাতলা চাদর তাকে জড়িয়ে থাকে, তার পেছন ছাড়ে না।

যা হোক, নারীদের মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতির যত কারণই থাকুক না কেন, এর সমাধানও অনেকটা নারীদেরই হাতে অস্বীকার করতে পারি না। পরিবারের নারী সদস্যরা যদি একটু সজাগ হন, একজন আরেকজনের প্রতি একটু মনোযোগী হন, সহানুভূতিশীল হন তাহলে মানসিক বিপর্যয়গুলো অনেকটাই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। আত্মবিশ্বাস নিয়ে সুস্থ জীবনযাপন করা সম্ভব। ■

টিপস

অফিস শেষে অহেতুক কেনাকাটায়

● নুসরাত জাহান

অনেকেই বলে থাকেন, মেয়েদের অন্যতম শখ নাকি শপিং করা! কথাটা আংশিক হলেও সত্যি। বেশ কয়েকটি জরিপে দেখা গেছে, মেয়েরা মন-মেজাজ খারাপ থাকলে, বিষণ্ন থাকলে, এমনকি রেগে থাকলেও কেনাকাটা বেশি করে। আবার মন ভালো থাকলেও বেশি কেনাকাটা করে!

অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে অনেকেই এটাসেটা কিনে থাকেন। এই কেনাকাটা যে সবসময় প্রয়োজনে করা হয়, তা কিন্তু নয়! অনেকে শখের বশে, ঝোঁকের মাথায় অথবা অভ্যাসের কারণেও কেনাকাটা করে থাকেন। হঠাৎ করে কিনে ফেলা জিনিসটি যদি তেমন প্রয়োজনীয় না হয় বা কাজের না হয়, তাহলে বাড়ি ফিরে মেজাজ ঠিক রাখাটাও মুশকিল হয়ে পড়ে। অহেতুক এই কেনাকাটার হাত থেকে মুক্তি পেতে চাইলেও চট করে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। তাই অবলম্বন করুন কিছু কৌশল।

* কাজের জায়গা থেকে বেরিয়েই বাস বা আপনার বাড়ি ফেরার বাহনে উঠে পড়ুন। বাড়ি ফেরার পথে অহেতুক রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করবেন না। ফুটপাতের দোকানে জিনিসপত্র দেখতে দেখতে হাঁটবেন না।

* নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা মুশকিল মনে হলে বাড়ি ফেরার পথে প্রয়োজনীয় বাজার করতে পারেন। তবে আগে থেকেই চিন্তা করে রাখুন আপনার কী দরকার। ফেরার পথে সেটা কিনুন।

* বাড়ি ফেরার হাঁটা পথ হলে কেনাকাটা একটু বেশিই হয়। কিছু একটা খেতে খেতে বাড়ি ফিরতে পারেন। এতে কেনার প্রবণতা একটু হলেও কমবে।

* মানুষ একা থাকলেই খুচরো জিনিস কেনে বেশি। তাই বাড়ি ফেরার পথে একজন সঙ্গী হলে ভালো হয়। আপনার কলিগ বা বন্ধুর সঙ্গে বাড়ি ফেরার চেষ্টা করুন।

* অন্য কোনো কাজ যেটা করতে টাকা খরচ হবে, যেমন ফটোকপি বা ফোনে টাকা লোড করা, এমন কোনো কাজ থাকলে বাড়ি ফেরার পথে করুন।

* বাসায় শুকনো খাবার সব সময়েই দরকার হয়। তাই উল্টো-পাল্টা জিনিস না কিনে বাড়ি ফেরার পথে এক প্যাকেট বিস্কুট বা অন্য কোনো শুকনো খাবার কেনার অভ্যাস করতে পারেন। ফল খেতে পছন্দ করলে বাড়ি ফেরার পথে ফলও কিনে আনতে পারেন।

* বাড়ি ফেরার আগ দিয়ে কোথাও আড্ডা দিতে শুরু করবেন না। মন বেশি ভালো থাকলে কেনাকাটা করার প্রবণতা বেড়ে যায়।

* কাজের জায়গা থেকে বের হওয়ার আধা ঘণ্টা আগে থেকেই মনে মনে বলা শুরু করুন, আজ আমার কোনো কিছু দেখার সময় নেই, বাড়িতে জরুরি কাজ

আছে, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে...। এটা নিজেকে নিয়ন্ত্রণের একটা উপায়। সেলফ কন্ট্রোল বা আত্মনিয়ন্ত্রণ খুব প্রয়োজনীয় একটা বিষয়। শুধু অহেতুক কেনাকাটা নয়, জীবনের যেকোনো ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হতে পারে। নিজের মন ও ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখুন। নিয়মিত মেডিটেশন ও যোগাসন এ ব্যাপারে সাহায্য করবে।

* অহেতুক জিনিস কিনে ফেললে আত্ম-সমালোচনা করুন। নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসের তালিকা তৈরি করুন এবং সেটা প্রতিদিন একবার করে দেখুন। এতে এলোপাতাড়ি শপিং করার প্রবণতা হ্রাস পাবে।

অতিরিক্ত কেনাকাটা করাও এক ধরনের মানসিক অসুস্থতা। প্রয়োজনবোধে কাউন্সেলিং করান। অর্থের অপব্যয় আপনাকে আর্থিক ও সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তাই নিজের অহেতুক কেনাকাটাকে গুরুত্ব দিন এবং তার প্রতিকারের ব্যবস্থা নিন। ■